সংবাদ

তারিখ ... 21 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের হালহকিকত

শ্যামল কুমার সরকার

২০১৬ সাল বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, ১৯৭১ এ বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে এত বড় ধরনের সরকারিকরণের ঘটনা ঘটেনি। সরকার ৩১৫টি স্কুল এবং ৩২১টি কলেজ সরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে ২৮৫টি কলেজ এবং ১৪৮টি মাধ্যমিক স্কুল সরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলমান। ইতোমধ্যেই স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের একাধিক তালিকা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আনন্দ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশের কাতারে বিভক্ত করেছে। সরকারিকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা সঙ্গত কারণেই মহাখুশী। তারা বলছেন যোগ্যতার কারণেই তাদের প্রতিষ্ঠান প্রধান মন্ত্রীর অনুমোদন পেয়েছে। আবার সুযোগ বঞ্চিতরা দাবি করছেন তারা ন্যায় বিচার পাননি। যোগ্যতাসম্পন্নদের অনেকেই হতাশায় চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন। দু'পক্ষের দাবি কখনোই সত্য হতে পারে না। আলোচিত ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। গত কয়েক মাসের জাতীয় দৈনিকের পাতায় এমন অনেক সংবাদ ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিষয়টি ভাবার।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবার জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ১৯৭৩ সালে এক যোগে এক দিনে ৩৬,১৬৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছিলেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের বেদনাদায়ক অধ্যায় সৃষ্টি না হলে অনেক আগেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু একই সিদ্ধান্ত নিতেন বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের ধারণা, যা হোক, দেরিতে হলেও জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কয়েক দফায় ২৬,১৪০টি বেসরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছেন। বর্তমান আমলে শেখ হাসিনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সরকারিকরণের কাজ শুরু করেছেন।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) দীর্ঘদিন ধরে সভাসমিতি ও স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে আসছে এবং এমন ব্যবস্থার মোদ্দাকথা হলো শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় থাকবে বেসরকারি কর্তৃপক্ষ আর আর্থিক দায়িত্ব নেবে সরকার। এমন ব্যবস্থা ভারতে চালু আছে। তবে এ তত্ত্ব বাংলাদেশ সরকার এখনো বুঝতে সক্ষম হননি। ফলশ্রুতিতে বাকবিশিস সরকারের চলমান সরকারিকরণ প্রক্রিয়াকে তথাকথিত জাতীয়করণ বলেই আখ্যায়িত করছে। তার পরেও বলা যায়, এর আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের গ্রহণযোগ্য কোন নীতিমালা ছিল না। বিভিন্ন সরকারের খেয়াল-খুশিমতো সরকারিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমনকি রাতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেও একজন সামরিক শাসক স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ করেছেন বলে জানা যায়।

আর এবার শেখ হাসিনার সরকার যে সব উপজেলায় সরকারি স্কুল কলেজ নেই সেসব উপজেলায় সরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। উদ্যোগটি শুভ। কয়েক দফায় বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকাও গণমাধ্যমে এসেছে। এতে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন সেরা কলেজগুলোকেই বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। অবশ্য সেরা স্কুল বা কলেজের কোন মানদণ্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশ করা হয়নি। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল, শিক্ষার্থী সংখ্যা, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অবকাঠামো, জমির পরিমাণ, পাঠদানের বিষয়, ক্যাচমেন্ট এরিয়া, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠানের ধরণ যেমন স্কুল হলে বিভাগ বিভাজন এবং কলেজ হলে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, অনার্স, মাস্টার্স ইত্যাকার বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। চলমান সরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। আর সমস্যার শুরু এখানেই।

উপজেলা সদরে সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি স্তরের প্রতিষ্ঠিত কলেজকে বাদ দিয়ে উপজেলা সদর হতে ১৮ কিঃ মিঃ দূরে নব্বই এর দশকে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি কলেজকে সরকারিকরণ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নাকি এমপির ডিও লেটারও লাগেনি। এ নিয়ে হাই কোর্টে রিট হয়েছে। আবার উপজেলা সদর হতে মাত্র ৯ কিঃ মিঃ দূরে পাকা সড়কের পাশে অবস্থিত ৩ গুণ বেশি শিক্ষার্থী থাকা ডিগ্রি স্তরের ঐতিহ্যবাহী কলেজকে বাদ দিয়ে উপজেলা সদরের উচ্চ মাধ্যমিক কলেজকে সরকারিকরণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি এমপিওভুক্তই হয়নি এমন কলেজও সরকারিকরণের তালিকায় আছে। আবার নাটোরে লালপুর উপজেলায় এবং গোপাল গঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় সরকারি কলেজ থাকতেও নতুন কলেজ সরকারিকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সদর উপজেলাকে সরকারিকরণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি। সদর উপজেলা জেলা সদরের মধ্যে পরাতে নাকি এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এটা কি সদর উপজেলায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি অবিচার নয়? এমন পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষাঙ্গনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা হতাশায় নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে কোনোমতে সময় পার করে দিচ্ছেন। আর একটি বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। সেটি হলো এমপির ডিও লেটার। ডিজিটাল বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগের সমস্ত তথ্যই শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে থাকার কথা। সবার প্রত্যাশা তাই। তার পরেও কেন সংশ্লিষ্ট এলাকার এমপির সুপারিশপত্র বা ডিও লেটার লাগবে তা শিক্ষক সমাজের বোধোগম্য নয়। এডিও লেটার প্রাপ্তি ও জাতীয়করণ নিয়ে দেশের উপজেলার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এমপির ডিও লেটার প্রদানের বিষয়টি এড়ানো গেলে ভালো হতো।

কারণ, শত চেষ্টার পরেও আমাদের মতো দেশে এখনো গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করা যায়নি। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভেবে দেখবেন বলে আশা করি। কারণ এতে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে। সরকারিকরণের ক্ষেত্রে অরাজকতার অন্যতম উদাহরণ ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজ। সরকারিকরণের আন্দোলনে এ কলেজের একজন শিক্ষক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এ কলেজের ক্ষেত্রেও হাই কোর্টে রিট করা হয়েছে। রাজশাহীর চারঘাটের আলহাজ এমএ হাজি কলেজে সরকারিকরণ নিয়ে ঝামেলা চলছে। চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর গোমদণ্ডি পাইলট মডেল হাই স্কুল, ভোলার মনপুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সরকারিকরণ নিয়ে জটিলতা চলছে। একই অবস্থা চলছে মেহেরপুরের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বগুড়ার শাহ্‌জাহানপুরের ডেমাজানি শহীদ মোখলেছুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটের বড়গাছি উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালির বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। অন্যদিকে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকরা সরকারিকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকরণ নিয়ে তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা আত্তীকরণকৃত কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি করলে কঠোর আন্দোলনে যাবার হুমকি দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য বিসিএস পাস না করে এর ফল কেউ দাবি করতে পারে না। তাদের দাবিকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্যদিকে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকরা ২০০০ সালের আত্তীকরণ বিধিমালা অনুযায়ী ক্যাডারভুক্তির দাবি করছেন। তাদের যুক্তি আগের আত্তীকরণকৃত শিক্ষকরা ক্যাডারভুক্ত হলে তারা কেন হবেন না। ক্যাডারভুক্তি নিয়ে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকরা দফায় দফায় প্রেস কনফারেন্স করে চলেছেন। সরকারের আত্তীকরণ বিধিমালা ২০১৭ তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ মহৎ হলেও এর বাস্তবায়ন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় জাতি কাঙ্ক্ষিত ফল হতে বঞ্চিত হবে। শিক্ষকদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে। সুযোগের বৈষম্য ও কর্মীদের অসন্তোষ বেড়ে যাবে। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষার মান আরও নিম্নগামী হবে।

কারণ, সরকারিকরণ মানেই বেতন-ভাতার শতভাগ নিশ্চয়তা। সেখানে অস্তিত্বের সংকটের কোন প্রশ্ন নেই। নেই কোন প্রতিযোগিতা। গ্রামীণ জনপদের নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারের সন্তানরা অল্প খরচে পড়ালেখার সুযোগ পাবে ঠিকই কিন্তু সরকারিকরণকৃত শিক্ষকদের ব্যাপক অংশের নিম্নমানের কারণে শিক্ষার মানে ধস নামবে। সরকারিকরণের তালিকাভুক্ত কলেজের একাধিক থার্ড ক্লাস প্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে সেকেন্ড ক্লাসের ডিগ্রির জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারেও ভাবা দরকার।

সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলে একদিকে নবীনদের কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে সুযোগ্য শিক্ষকদের পাঠদানের মাধ্যমে উপযুক্ত নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে। পরিশেষে বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি'র (বাকবিশিস) একজন সদস্য হিসেবে এ কথাই বলতে চাই যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বর্তমান সরকার বাকবিশিসের জাতীয়করণের মডেলে আস্থা না রাখলেও সরকার প্রকারান্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দিকেই ধাবমান। আশা করি অচিরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা ও তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয়করণের তালিকার বাইরে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারের চলতি মেয়াদেই জাতীয়করণের কাজ শেষ করবেন।

সরকারিকরণকৃত শিক্ষকদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে। সরকার মূল বেতনের পুরোটাসহ আংশিক ভাতা এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বেতন ও প্রতিষ্ঠানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে নিলে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণ মোটেও কষ্টসাধ্য কোন কাজ নয়। দরকার শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছার। যত দ্রুত সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ সম্পন্ন হবে ততই মঙ্গল। টেকসই, মানসম্পন্ন ও বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের কোন বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ জরুরি।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, ঝিটকা খাজা রহমত আলী ডিগ্রি কলেজ]